Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 06 - 17
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : এক অনন্ত জীবন সুধার উৎস

ড. রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী
Email ID: rubelpalsans513@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Shrimad Bhagwat Geeta, Monu Sanhita, uponishad, karmayog, food habits, Sttaprajna.

Abstract
Shrimadvagbatgeeta, the dialogue between Lord Krishna and Arjuna, has critically been hailed as a treatise on philosophy and Indian ethics. However, the text manifests an exploration of human management in which Lord Krishna appears as a mentor to Arjuna, who was in a state of confusion and dilemma. The dilemma of Arjuna is moral and ethical as it involves dimensions of relationship with kins. Lord Krishna, in his deliberations on duties, consistency, accomplishments of the tasks assigned and selfless actions impart not only motivation and zeal to Arjuna to overcome the dilemma and procrastination, but also guides him to emancipation via selfless devotion.

The purpose of the paper is to explore the psychoanalytic subtext embedded in Shrimadvagbatgeeta by reviewing the sermons of Lord Krishna to Arjuna.

Discussion

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরস্পর মুখোমুখি দুই পক্ষ, একদিকে কৌরবরা, আরেকদিকে পাণ্ডবরা। জীবনের বহু সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে তারা এখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রস্তুত হয়েছে। বেজে উঠেছে তাদের বিভিন্ন পাঞ্চজন্য, অনন্তবিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক ইত্যাদি শঙ্খ। বেজে উঠেছে আনক, প্রণব, গোমুখ, সিঙ্গা, ঢাক, ঢোল, কাসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সকলেই এখন পরস্পরের দিকে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে যথাযোগ্য ভাবে প্রস্তুত। এইরকমই এক তুমুল ভয়ংকর পরিস্থিতিতে মহাবীর অর্জুন হঠাৎ করে বলে উঠল আমি যুদ্ধ করবো না। অর্জুন তার স্বধর্মকে বিস্মৃত হয়ে আরো বলতে লাগলো, আমি যুদ্ধ করবো না আমার সারা শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে, আমার মুখ শুকিয়ে আছে, গাত্রে জ্বলন হচ্ছে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুলিত হয়ে ভ্রমিত হচ্ছে। অর্জুন বলতে থাকেন, -

> "সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
> বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।।
> গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
> ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।।"[1]

অর্থাৎ এই প্রকারে ভারসাম্যহীনতায় অর্জুনের হাত থেকে তার যুদ্ধের নিমিত্ত যে প্রধান অস্ত্র গান্ডীব, তাও পতিত হচ্ছে। আর এর কারণ স্বরূপ অজুহাত দিতে গিয়ে অর্জুন বললো, সে নাকি যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করতে এসেছে, যাদেরকে পরাজিত করতে এসেছে, তারা সকলেই তার প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-স্বজন। অর্জুনের এহেন বাক্য শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং দৃঢ়চিত্তে অনুভব করলেন যে অর্জুনের এহেন আচরণের পশ্চাতে যে মূল কারণ লুকিয়ে আছে, তা হল অর্জুনের ভীরুতা, কাপুরুষতা, হৃদয়ের দুর্বলতা এবং স্বধর্মের বিস্মৃতি। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাঙ্খ্য-যোগ থেকে অন্তিম অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষসন্ন্যাস-যোগ পর্যন্ত অবশিষ্ট তার প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে অর্জুনের জীবনের এই সমস্যা, তার মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা দূর করার প্রয়াস করেছেন এবং অন্তিমে তিনি অর্জুনকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এরই পরিনাম স্বরূপ অর্জুন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার এই আচরণের পশ্চাতে ছিল তার মোহ, ভয়, দুর্বলতা এবং আত্মবিস্কৃতি। অর্জুন নিজেই তার স্বীকারোক্তিতে বলেন, -

“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।”[২]

অর্থাৎ অর্জুন তার দুর্বলতা এবং কাপুরুষতাবশত হারিয়ে ফেলা স্মৃতি ফিরে পেয়েছে, সে এখন স্থিতি লাভ করেছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা মতো যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তার যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে একমাত্র শ্রেয় কর্তব্য। আর আমার মনে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রেম ও যুদ্ধের শুদ্ধতাকে মাথায় রেখে একটি কথা এই সমাজে খুব বহুল প্রচলিত আছে, প্রেম এবং যুদ্ধের ময়দানে অগ্রগমনই একমাত্র উপায় (Everything is fair in love and war)।

আমরা আজ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাক্যের দ্বারা কিভাবে অর্জুনের এই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ফিরে এলো এবং অর্জুন একজন প্রকৃত বীররূপে আবার বর্তমান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হল, তা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ছন্দে ছন্দে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাকে বীর মন্ত্র প্রদান করে তার প্রকৃত ধর্ম বা স্বধর্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, -

“কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।
ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।”[৩]

অর্থাৎ অর্থ : হে প্রিয় অর্জুন, এই ঘোর সংঙ্কটময় যুদ্ধস্থলে যারা প্রকৃত জীবনের মূল্য বোঝেনা সেসব অনার্যের মত শোকানল তোমার হৃদয়ে কিভাবে প্রজ্জলিত হল। এই রকমের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোক থেকে বঞ্চিত করবে এবং পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশরাশি বিনষ্ট হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই অসম্মানজনক কাপুরুষোচিত হৃদয়ের দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করে প্রকৃত বীরের মত আত্মমর্যাদায় উত্থিত হতে উপদেশ দেন।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ আত্মোপদেশ দানের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সংশয় প্রকাশ করেন যে, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, - এদেরকে হত্যা করলে তার মহাপাপ হবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানদানের মাধ্যমে অর্জুনের অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি অর্জুনকে বুঝিয়ে বলেন যে, অর্জুন যে সংশয় প্রকাশ করছে দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদেরকে হত্যা করার বিষয়ে তা খুবই অমূলক। সে আসলে তাদেরকে কখনোই সে হত্যা করতে পারবে না। কারণ তাদের মধ্যে যে চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অজর, অব্যয় আত্মা আছে, তা অবিনশ্বর। তাকে কখনোই অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, জল দিয়ে সিক্ত করা যায় না, বায়ুর দ্বারা শুষ্ক করা যায় না এবং অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা যায় না। কৃষ্ণ বলেন, -

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ন চৈনং ক্লেদযন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।”[৪]

বস্তুতপক্ষে সর্বভূতের মধ্যেই এই আত্মা বিরাজমান। তার কোন উৎপত্তি নেই, ধ্বংসও নেই। প্রকৃতপক্ষে এই আত্মা হল শাশ্বত এবং চিরন্তনন। কিন্তু এই শরীর হচ্ছে নশ্বর। তার উৎপত্তি হয় এবং ধ্বংসও হয়। যেমন জামা ছিঁড়ে গেলে আমরা নতুন জামা গ্রহণ করি, পুরানো জামা ফেলে দিই, তেমনি এই আত্মা শরীর জরাজীর্ণ হয়ে গেলে সেই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে খুব সুন্দর উপমা সহযোগে বলেন, -

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।”[৫]

বস্তুতপক্ষে শরীর যে সব সময় বার্ধক্যের কারণে অথবা রোগব্যাধির দ্বারা জরাজীর্ণ হয় তা নয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য ইত্যাদি ষড়রিপুর আধিক্য হলেও সেই শরীর জগৎ-কল্যাণের নিরিখে জরাজীর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এখানে দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবদের শরীর ও তদনরূপ জরা-জীর্ণ, যা সমাজের জন্য হানিকর ও অকল্যাণকর ছিল। তাই শুধুমাত্র সেই শরীল বা দেহকে নষ্ট করাই এখন অর্জুনের শ্রেয়, কিন্তু যেহেতু সেই শরীরের অন্তর্গত শরীরী বা দেহীকে অর্জুন কোনমতেই নষ্ট করতে পারবে না, অতএব সে বিষয়ে অর্জুনের চিত্ত ধীর এবং শান্ত হওয়া উচিত। কোন মতেই অর্জুনের মন বা চিত্ত শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে বলেন, -

“দেহিনোস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।”[৬]

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। ধরা যাক জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বিনামাইট প্রভৃতি বোমার আবিষ্কার বিজ্ঞান করেছে। অর্থাৎ বোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তা জগৎ কল্যাণের নিরিখে শুভশক্তি। কিন্তু আমরা দেখি এই কিছু কিছু তোমাকেই আবার জগতের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত মানুষকে মারার জন্য কখনো কখনো এই বোমার শরীরকে বিকৃতভাবে নির্মাণ করে জনবহুল স্থানে রেখে দেওয়া হয়। তখন কিন্তু এই বোমাকেই জগৎ কল্যানের নিমিত্ত বোম-স্কয়ারের বিশেষ প্রশিক্ষকদের দ্বারা নিষ্ক্রিয় করতে হয়। তেমনি আমরা যদি গীতার প্রেক্ষাপটে কৌরবদের দ্বারা সমাজের প্রতি যে অত্যাচার, তার বিচার ও বিশ্লেষণ করি এবং সেই দিকে নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে খুব সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব, তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই কৌরবরা ছিল সমাজের কাছে এক-একটা বিষাক্ত বোমা। সুতরাং অর্জুনদের দ্বারা এই ধরনের অশুভশক্তির বিনাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা ছিল তৎকালীন সমাজের কল্যাণের নিরিখে অত্যাবশ্যক এবং প্রাসঙ্গিক কার্য। আর তাই শ্রীকৃষ্ণ তার এই মূল্যবান আত্মোপদেশ দানের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে সেই অশুভশক্তির বিনাশের জন্য প্রেরিত এবং প্ররোচিত করেন। এবং এরই মাধ্যমে অর্জুনকে সকল বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেতে যথাযথ সাহায্য করেন।

শুধু আত্মোপদেশ নয়, জীবনের যেকোনো অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরো নানান উদাহরণ ও উপদেশ দিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দেন। তাই তিনি সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ভয় এবং ক্রোধে অর্জুনের মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে নিষেধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, -

“দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।”[৭]

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করতে বলেন, যার ফলে তাকে কোন পাপের ভাগী হতে হবে না। এইভাবেই জীবনের সফলতায় এবং বিফলতায় যদি অর্জুন স্থির থাকতে পারে তবেই

সে একজন প্রকৃত যোগী হয়ে উঠতে পারবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে এইভাবে খুব সরল উপায়ে যোগস্থ চিত্তে কর্ম করার উপদেশ দিয়ে বলেন, -

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।"[৮]

এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মানসিক স্থিতি এবং তার স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে তার প্রকৃত স্বধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্মকে অবগত করান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তিনি প্রত্যেকটি মানুষের গুণ এবং কর্তব্য কর্মের ভিত্তিতেই এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, - এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ বলেন, -

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। ..."[৯]

এই ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্বন্ধে মনুসংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করে প্রজা সাধারণের রক্ষা করাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, -

"ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে।।"[১০]

এই ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রসঙ্গে মনুস্মৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় রাজা শুধু নিজের স্বধর্ম পালন করবেন এমনটা নয়, চার আশ্রম এবং চার বর্ণের যে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম, তা যারা পালন করেন তাদেরকেও তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। তাই মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম-প্রকরণে বলা হয়েছে, -

"স্বে স্বে ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপুর্বশঃ।
বর্ণানামশ্রমানাঞ্চ রাজা সৃষ্টোভিরক্ষিতা।।"[১১]

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা যদি স্বধর্মত্যাগীদের রক্ষা না করেন, তাহলে সেইক্ষেত্রে তার কোন পাপ হবে না। আর এমতাবস্থায় অর্জুনও যদি তার ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে নিজর স্বধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে স্বধর্মত্যাগী কৌরবদের রক্ষা না করেন, তাহলে তার পরিণামের পুন্যই হবে, কিন্তু পাপ কখনোই হবে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার এই ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করিয়ে বলেন যে, তার যুদ্ধ করাই হচ্ছে একমাত্র শ্রেয়। কৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলেন, -

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।
অথ চৈত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।"[১২]

শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুন যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করে, তাহলে সে তার স্বীয়কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মহাপাপ ভোগ করবে। শ্রীকৃষ্ণ আরো স্পষ্টভাবে বলেন যে, তার পক্ষে বহুগুণযুক্ত পরধর্ম পালন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রের বিগুণ স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে নিহত হওয়াও অনেক বেশি সম্মানের। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগে বলেন, -

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত্।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"[১৩]

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জীবনের প্রকৃত জ্ঞানদানের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে কিভাবে কর্ম করতে হবে, সেই বিষয়ে প্রকৃত কর্মতত্ত্ব উপদেশ দিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আসক্তিহীনভাবে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেন। এখানে নিষ্কাম কর্ম বলতে অবশ্যই কর্তব্য কর্মকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কোন ব্যক্তি যদি তার কর্তব্যকর্ম যথাযথ পালন করে তবে সে

কখনোই সেই কর্মের ফলের কথা ভেবে ভেবে হতাশগ্রস্থ হয় না। বস্তুতপক্ষে অর্জুন এখানে যে তার কর্তব্যকর্ম ধর্মের রক্ষা করা এবং অধর্মকে নাশ করা সেটা বুঝতেই পারেনি। আর সেই কারনেই সে কর্মের বিভিন্ন ফলের কথা চিন্তা করে হতাশায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলেন তোমার কেবল কর্মেই অধিকার আছে, ফলে নয়।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি।।"[১৪]

এই কর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার 'জ্ঞানযোগে' কর্মের প্রকারভেদ সম্বন্ধে অবগত করিয়ে বলেন, -

"কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।"[১৫]

অর্থাৎ সাধারণত তিন প্রকার কর্ম এই পৃথিবীতে মানুষ করে থাকে, - সকাম কর্ম, বিকর্ম বা জগতের পক্ষে অকল্যাণকর কর্ম এবং অকর্ম অর্থাৎ উদাসীন কর্ম কর্মত্যাগ। কিন্তু যে ব্যক্তি এই তিন প্রকার কর্ম করা সত্ত্বেও কর্মফলে আসক্তি রাখেনা অর্থাৎ কর্ম বন্ধনে লিপ্ত হয় না, তার কর্মই নিষ্কাম-কর্মরূপে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায় বলেছেন, -

"ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ।।"[১৬]

বস্তুতপক্ষে এইভাবে কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে কোন ব্যক্তি যদি কর্মকে কর্তব্য মনে করে কর্ম করে যান, তাহলে তিনি কখনোই এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীত পরিস্থিতিতেও হতাশগ্রস্থ বা দ্বিধাগ্রস্ত হন না। এরকম বিপরীত পরিস্থিতিতে তিনি জীবনের মূল সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে কখনোই পাপের ভাগই হন না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, -

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।"[১৭]

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরব্রত, আত্মজ্ঞান লাভ, ভারসাম্যবজায়, স্থিতপ্রজ্ঞ, স্বধর্মপালন, নিষ্কাম-কর্ম ইত্যাদি নানান উপায়ে জীবনের মূল রহস্য বিষয়ে জ্ঞান দান করতে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের এমন একজন বন্ধু যিনি খুব হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে এইভাবে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, এবং সেটা বাস্তবজীবনে পালন করা, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক বিস্তর। তাই যাতে এই জ্ঞান অর্জুন তাঁর জীবনে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে, তার জন্য তিনি বিভিন্ন যাপন-পদ্ধতি অর্থাৎ উপায় বা কৌশল বিষয়েও অর্জুনকে যথার্থ ভাবে বলতে থাকেন। শ্রদ্ধার দ্বারাই কোন জ্ঞান যথার্থভাবে লাভ করা যায়। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগে বলেছেন, -

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্ব পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।"[১৮]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যথার্থ শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে, এবং এই অর্জিত জ্ঞানকে নিজের জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল হয় না সে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আপাতো ভাবে যদিও সে কিছুটা পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে, তথাপি তার যথার্থ শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার অভাবে সেই জ্ঞান কখনোই জীবনে কার্যকরী হয় না। এই দুই ধরনের ব্যক্তিই সমাজে বস্তুতপক্ষে অজ্ঞরূপে পরিগণিত হন। এর ফলস্বরূপ এই ধরনের অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মন সর্বদা সংশয় বা দ্বন্দ্বের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। হরি নামে এই ধরনের দ্বন্দ্বের ফলে সেই ব্যক্তি কখনোই ইহলোকে বা পরলোকে সুখ ভোগ করতে পারে না। সুতরাং জীবনকে যদি সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শ্রদ্ধাবান হয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে

আমাদের মন থেকে সমস্ত প্রকার সংশয় বা দ্বন্দ্বকে দূর করতে হবে। এইভাবে যদি আমাদের জীবনে একটা স্থিরতা আসে, তখনই জীবনের প্রকৃত আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, -

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।"[১৯]

অর্থাৎ যিনি অজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাহীন তিনি নিশ্চিতরূপে সংশয়াত্মা। পরিণামে তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই ধরনের ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে, কোথাও সুখ ভোগ করা সম্ভব হয় না।

এই অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য যদি যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে হয়, তাহলে সেই বিষয়ে ভগবান গীতায় আরো তিনটি পথ খুব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। জীবনযাপনের এই তিনটি পথ বা উপায় হল - ১. বিনয় বা অনুগত চিত্ত বা শরণাগতি, ২. পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ জ্ঞানের পিপাসা বা জিজ্ঞাসা, ৩. সেবা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন, -

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।"[২০]

অর্থাৎ এই তিনটি উপায়ে যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্নশীল হন, তখন সেই সর্বজ্ঞপুরুষ তার সম্মুখে প্রকঠিত হয়ে অর্থাৎ তার অন্তরাত্মায় বিকশিত হয়ে তাকে প্রকৃত জ্ঞানী করে তোলেন।

বস্তুতপক্ষে কোন জ্ঞান অর্জন করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই বিশ্বাসপূর্বক, যেখান থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করব সেই বিষয়ের প্রতি বা ব্যক্তির প্রতি আমাদেরকে আস্থা রাখতে হবে। এই অকৃত্রিম বিশ্বাস বা শরণাগতির দ্বারাই যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। এখানে শরণাগতি বলতে অত্যন্ত একাগ্রতার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন, -

"সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"[২১]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলছেন, হে অর্জুন তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শ্বরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। এখানে তাৎপর্য এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার শরণাগত হতে বলছেন অর্থাৎ তিনি যে কথা বলছেন, একাগ্রচিত্তে সেই কথা শুনে সেই লক্ষ্যে স্থিতধী হতে বলছেন। অর্জুন এখানে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে যুদ্ধ করতে এসেছে। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদেরকে পরাজিত করাই অর্জুনের একমাত্র লক্ষ্য এবং ধ্যান-জ্ঞান হওয়া উচিত লক্ষ্য। আর শ্রীকৃষ্ণের এই প্রদত্ত জ্ঞান তখনই অর্জুন তার জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারবে, যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত বা শরণাগত হবে। আর তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করতে পারবেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত বানীস্বরূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা অর্জুন তাঁর জীবন যুদ্ধে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের দ্বারা সুরক্ষিত হবে এবং চির অক্ষয় শান্তি লাভ করতে পারবে।

আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ের জ্ঞান নারান ভাবে বাস্তবায়িত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে খুব স্পষ্টভাবে এটাও বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রদত্ত জ্ঞান অর্জুন যেভাবে গ্রহণ করবে, সেই ভাবেই সে তার জীবনে ফল পাবে। যদি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথা মত একাগ্র চিত্তে শরণাগত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, তবেই অর্জুন তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, -

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।"[২২]

অর্থাৎ যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেই ভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতভাবে আমাকে অনুসরণ করে। জ্ঞান লাভের দ্বারা শান্তি লাভের উপায় হিসেবে ভগবান একেই প্রণিপাত বা শরণাগতি বলেছেন।

দ্বিতীয় উপায় হল পরিপ্রশ্ন। অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হলে আমাদের মনের মধ্যে সাধারণভাবে একটা ভীতি বা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তখন সে ভয় বা দুর্বলতার কারণে নিজের জীবনের এই সমস্যাকে দূর করার জন্য কি উপায়, সে বিষয়ে বারংবার প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু এখানে গীতায় আমরা দেখব অর্জুনের মধ্যে এই প্রশ্ন করার মানসিকতা কিন্তু প্রথম থেকেই বিদ্যমান। খাইছে প্রথম অধ্যায় থেকেই তার জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও মনের সংশয়কে দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে বারংবার বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে। আর এইভাবে বারংবার প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই অর্জুন আবার তার জীবনে ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে এবং তার কর্তব্য উপলব্ধি করে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে। আর তৃতীয় বিষয়টি হল সেবা। এই সেবা হল অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রেম থেকে উৎপন্ন জীবনের একটি বিশেষ গুণ, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি নিজেও সন্তুষ্টি লাভ করে এবং অপরেরও সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হয়। অর্জুনের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সেবাভাব প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিলে। যার ফলে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত জ্ঞান অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরিণামে জয়ের সুখ পেয়েছে।

জীবনকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্যতম গুণ হল সন্তোষ বা সন্তুষ্টি। শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবী এই প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটি উক্তি করেছেন, - 'সন্তোষের সমান গুণ নাই।' তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, -

"যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।"[২৩]

অর্থাৎ যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-অনুরাগ ইত্যাদি বিপরীত পরিস্থিতিতেও দ্বন্ধের বশীভূত হন না এবং যিনি কার্যের সাফল্য এবং অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না। আবার এই একই প্রসঙ্গে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলেছেন,-

"তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিত্।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ।।"[২৪]

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে বোঝাতে চাইলেন, যে ব্যক্তি নিন্দা এবং স্তুতি উভয় অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সকল পরিস্থিতিতেই নির্ভীক ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হন। অর্থাৎ তিনি হরিনামে চিরশান্তি লাভ করেন। ভাই এই মহাজগতে মানুষ যতই পায়, আরো বেশি পেতে চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি তার সীমিত অথবা অসীম পাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই আখেরে সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের উপদেশ শুনেও অর্জুন কিন্তু তার মনের বিভিন্ন সংশয় থেকে সহজে বের হতে পারেননি। অর্জুনের মনে ঘোরাফেরা করতে থাকে নানান প্রশ্ন, যা তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। অর্জুন যেন আমাদেরই মতো ভাবতে থাকে, কোন মানুষই তো স্বেচ্ছায় পাপাচারে লিপ্ত হতে চায় না। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কেউই চায় না যে, সে দুঃখে থাকুক, খারাপ থাকুক, অসুস্থ থাকুক। কিন্তু তবুও সে চাইলেও এই ধরনের খারাপ থাকা থেকে অর্থাৎ পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারে না। বরং কেউ যেন তাকে পিছন থেকে জোর করে সেই অসুস্থ জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের জীবনে ভয়ংকর পরিস্থিতি কেন সমুপস্থিত হয়, তা জানার জন্য অর্জুন আবার তার বন্ধু, প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করে -

"অথ কেন প্রযুক্তোয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।"[২৫]

অর্থাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন - হে বাঞ্চেয় (কৃষ্ণ), মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন বলপূর্বকই নিয়োজিত হয়ে পাপাচারণে প্রবৃত্ত হয়?

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার কারণ স্বরূপ পাপাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পশ্চাতে দুটি বিষয়কে উল্লেখ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, -

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।"[২৬]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতির তিনটি গুণ বিরাজমান, - সত্ত্ব (super ego), রজঃ (Ego) এবং তমঃ (Id)।

এই রজোগুণ থেকে মানুষের মধ্যে কাম এবং ক্রোধের উৎপন্ন হয়। এই কামনার তৃষ্ণা এতই দুষ্পূরণীয় যে, আগুন যেমন কোন খাদ্যেই তৃপ্ত হয় না তেমনি কামনাও অধিক হতে অধিক প্রাপ্তিতে ও তৃপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যখন কোন এক বিষয়ের জন্য বারংবার চিন্তা করতে থাকে, তখন সেই চিন্তা থেকে আসক্তি জন্মায়। আর এই আসক্তি পরবর্তীতে অতৃপ্ত বাসনায় রূপান্তরিত হয়ে কামনার আগুনে মানুষকে দগ্ধ করতে থাকে। কামনা থেকে উৎপন্ন হয় ক্রোধ, ক্রোধ থেকে প্রচন্ড মোহ। আর এই মোহজনিত অজ্ঞতার কারণেই মানুষ তার নিজের জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়। আর এই আত্মবিসৃত জীবনে তখন আর কোন বুদ্ধি বা বিবেচনা কাজ করে না। এইভাবে কামনা ও ক্রোধের বসবর্তী হয়ে একজন সুস্থ মানুষ ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই রকমই শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে দুঃখ-দুর্দশার কালো মেঘ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের জীবনের এই দৈহিক ও মানসিক ভাবান্তরের ক্রমিক চিত্রটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, -

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাত্ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি।।"[২৭]

এইভাবে ক্রমানুসারে মানুষের জীবনে কিভাবে দুঃখ নেমে আসে শ্রীকৃষ্ণ তা অর্জুনকে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে কাম এবং ক্রোধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন।

উতীকৃষ্ণের এতসব উপদেশ শোনার পরেও অর্জুনের মন চঞ্চল হতে থাকে। বস্তুতপক্ষে মনের ধর্মই হচ্ছে চঞ্চলতা। মন এতটাই চঞ্চল যে, এই মুহূর্তে যদি ঘরের এক কোণে আবদ্ধ থাকে, আবার ঠিক তার পরমুহূর্তে এই মহাকাশের যে কোন গ্রহ-নক্ষত্রে ঘুরে বেড়াতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মনকে সর্ষের পুটুলির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অতি সযত্নে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা আমাদের মনকে একাগ্র রাখতে হয়। কিন্তু যদি একটুও বেগতিক হয়, এই মন তৎক্ষণাৎ সর্ষের পুটলির বাঁধন খুলে যাওয়ার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনের এই অতিচাঞ্চল্য ধর্ম বিষয়ে অর্জুন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঘ্যানযোগে বলেছেন, -

"যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাত্ স্থিতিং স্থিরাম্।।"[২৮]

অর্থাৎ অর্জুন বললেন - হে মধুসূদন, তুমি যে যোগ (যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ) উপদেশ করলে, আমার মনের চঞ্চল স্বভাববশত আমি তা সত্ত্বেও নিশ্চল স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ কৃষ্ণ যদিও তাকে অনেক জ্ঞান উপদেশ দিলেন এবং সেই জ্ঞান তার জীবনে পালন করার জন্য উপায় বললেন, তথাপি অর্জুন তার মনের চঞ্চলতার কারণে কোন মতেই সাম্যবস্থায় তার মনকে স্থির করতে পারছেন না। তাই অর্জুন বলেই ফেলল যে, তার মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং অত্যন্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিক্ষেপ উৎপাদক। তার পক্ষে এই মনকে বিষয় বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও কঠিন। অর্জুন বলল, -

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।"[২৯]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের মনের এই দশা দেখে প্রকৃত বন্ধুর মতো প্রথমে তার বক্তব্য ভালো করে শুনলেন এবং মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও তাকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন তা স্বীকারও করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিরন্তর অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে সংযত করার উপদেশ দিলেন। বস্তুতো পক্ষে অভ্যাসই কোন মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে। অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ তার জীবনের যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত তিনি বৈরাগ্য বা ত্যাগের উপদেশ দিলেন। আমাদের জীবনে অনেক সময় এমন কিছু বিষয় থাকে, যেগুলোকে আমরা তৎক্ষণাৎ ভেবে ভেবেও কোন কুলকিনারা খুঁজে পাইনা। সেই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সেই সমস্যা বহুল বিষয়কে অপেক্ষা কর আবার ত্যাগ করাই একমাত্র শ্রেয়। ঈশোপনিষদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, -

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।"[৩০]

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপরের ধনে লোভ না করে, অপ্রয়োজনীয় সম্পদকে ত্যাগ করেই জীবন যাপন করা একমাত্র শান্তিলাভের প্রধান উপায়। তাই এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, -

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।"[৩১]

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে মহাবাহো অর্জুন, এই মন যে দুর্বার ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

তবে এই মনকে বশীভূত করার মাধ্যমে জীবনে শান্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ভগবান শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন বা অপরের উপদেশ গ্রহণের কথা বলেই অর্জুনকে ক্ষান্ত হননি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথাও বারংবার এই গীতাতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষ চাইলে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারে এবং যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, সেই সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, -

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েত্।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।"[৩২]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তোমার নিজের নিজেকেই উদ্ধার করা উচিত, কিন্তু কখনোই নিজেকে অবসাদগ্রস্থ করা উচিত নয়। কারণ তুমি মনে রেখো আমরা নিজেই নিজের বন্ধু, আবার নিজেই নিজের শত্রু।

বস্তুতপক্ষে যিনি তার ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করে সংযত মনের দ্বারা নিজেকে যেকোন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, তখন তিনি নিজেই তার বন্ধু হন। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কাজ করতে অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের শত্রুরূপে নিজেকে বিপদে ঠেলে দেন।

এই আত্ম-নিয়ন্তন বা আত্মসংযম বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মনুষ্য জীবনে পালনীয় আরো যে অনেকগুলি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল, - পরিমিত আহার, পরিমিত বিহার বা ভ্রমণ, কাজ করার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা, পরিমিত নিদ্রা এবং সঠিক সময়ে জাগরণ। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যান-যোগে খুব সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, -

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।"[৩৩]

অর্থাৎ যিনি পরিমিত আহার বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা জাগরণ নিয়মিত তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে পরিমিত আহার বা বিহার, এই সমস্ত কিছুই করতে গেলে জীবনে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব জীবন প্রকৃতির যে তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজ ও তম, তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সত্ত্ব-গুণ শান্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাবিল আনন্দের প্রতীক। রজোগুণ জীবনের চঞ্চলতা ও উদ্যমের প্রতীক, আর তমোগুণ অজ্ঞানতা ও হতাশার প্রতীক। আর মনুষ্যজীবনে এই তিন প্রকার গুণের তারতম্য দেখা যায় মূলতঃ তিন প্রকার আহার গ্রহণের ফলে। এই আহার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ভেদে তিন প্রকার। এই প্রসঙ্গে কি তার সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যে আহার গ্রহণ করলে মানুষের জীবনে বল বৃদ্ধি পায় এবং আরোগ্য লাভ হয় তাকেই সাত্বিক আহার বলে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, -

“আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।”[৩৪]

অর্থাৎ যে সমস্ত আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরল, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম সেগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়।

আবার রাজসিক আহার হল - মনুষ্যজীবনের দুঃখ, শোক এবং রোগ উৎপাদনকারী। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে বলেছেন, -

“কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।”[৩৫]

অর্থাৎ যে সমস্ত আহার দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণযুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর সেগুলি রাজসিকদের প্রিয় হয়। আর তামসিক আহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না হওয়ার ফলে যে সমস্ত খাদ্য বাসি হয়ে গেছে, যা নিরস, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পূর্বদিনে রান্না হয়ে পর্যুষিত এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধ্য দ্রব্যসকল তামসিক লোকের প্রিয়। তিনি বলেছেন, -

“যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যত্।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।”[৩৬]

উপরের এই সম্পূর্ণ আলোচনা থেকে আমরা এটা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলাম যে গীতার শুধুমাত্র একটি সনাতনী ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি একটি অনন্ত জীবনের সন্ধানে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার নিরিখে বাস্তবিক সহায়ক গ্রন্থ। এখানে জীবনের প্রতিটি আঙ্গিক তার সে মানসিক স্থিরতা তথা খাদ্যাভ্যাস, এই সমস্ত কিছুই অতি সুচারু ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থটি মানব জীবনের কল্যাণার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রামানিক ও বৈজ্ঞানিক উপজীব্য স্বরূপ।

Reference:

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদ যোগ, শ্লোক ২৯, ৩০
২. তদেব, অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষ যোগ, শ্লোক ৭৩
৩. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ২, ৩
৪. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ২৩
৫. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ২২

৬. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ১৩
৭. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৫৬, ৩৮
৮. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৪৮
৯. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ১৩
১০. মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, রাজধর্ম, শ্লোক ৭/১৪৪
১১. তদেব, সপ্তম অধ্যায়, রাজধর্ম, শ্লোক ৭/৩৫
১২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৩১, ৩৩
১৩. তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম যোগ, শ্লোক ৩৫
১৪. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৪৭
১৫. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ১৭
১৬. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ২০
১৭. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ২১
১৮. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ৩৯
১৯. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ৪০
২০. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ৩৪
২১. তদেব, অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষ যোগ, শ্লোক ৬৬
২২. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ১১
২৩. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ২২
২৪. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তি যোগ, শ্লোক ১৯
২৫. তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম যোগ, শ্লোক ৩৬
২৬. তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম যোগ, শ্লোক ৩৭
২৭. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৬২, ৬৩
২৮. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৩৩
২৯. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৩৪
৩০. ঈশাবাস্যোপনিষদ্ মন্ত্র ১
৩১. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৩৫
৩২. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৫
৩৩. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ১৭
৩৪. তদেব, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ, শ্লোক ৮
৩৫. তদেব, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ, শ্লোক ৯
৩৬. তদেব, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ, শ্লোক ১০

Bibliography:

উপনিষদ (ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, বাংলা), গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ফোর্থ রিপ্রিন্ট - ২০০৮
জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০০৩
পাল, বিপদভঞ্জন, সাংখ্যকারিকা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪১৭, কলকাতা - ৭০০০০৬
মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, উপনিষদ্ সংগ্রহ, গ্রন্থিক সংস্করণ, কোলকাতা, ১৪১৫

রামসুখদাস, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, সাধক-সঞ্জীবনী, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর- ২৭৩০০৫ (ইন্ডিয়া), ISBN 81-293-0053-2, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা - ১৪১০

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতি শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ৭০০০০৬, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০০

বসু, অনিলচন্দ্র, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১০

বেদান্তচঞ্চু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর - ২০০৭/c, ISBN-81-247-0615-91

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্লোকার্থসহ গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ISBN 81-293-0439-2, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম-কথিত, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর - ২০০৮

সাহা, ঐশানি, শ্রীমাকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স, কলকাতা - ৬, পরিমার্জিত সংস্করণ - ২০১১

স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু, শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, দা ভক্তিবেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট, ISBN: 978-93-85986-22-2

AMAL, BRAHMACHARINI, Swami Vivekananda Life ana Teachings (Published on the occasion of 150th birth anniveraary of Swami Vivekananda), Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah, W.B, India, October 2012

Pramananda, Swami, SELF MASTERY, Ramakrishna Math Priting press, Madras-600004, India